The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIV, 2018 (pp.187 - 198)
Published in October, 2023

ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার বিকাশধারা

আলতাফ হোসেন*

প্রতিপাদ্যসার

পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাসমূহের মধ্যে ফারসি ভাষা অন্যতম। এই ভাষা খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে ইরানে উদ্ভব হয়। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই ইরানি ইসলাম প্রচারক, সুফি-সাধক ও বণিকগণ ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার করেন। এতদঞ্চলে মুসলিম ইতিহাসের সাথে ফারসি ভাষার নিগূঢ়তম সম্পর্ক রয়েছে। ১২০৩/৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতবর্ষে প্রায় ৬৩৪ বছর রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফারসি। ফলে পারস্য ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার সাথে ভারতবর্ষের ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফারসি ভাষা ভারতবর্ষের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। তৎকালীন শাসকগণ এ অঞ্চলের কবি-সাহিত্যিকদেরকে ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বিশেষকরে সুলতান মাহমুদ, নাসির উদ্দিন মাহমুদ বোগরা খান, রোকন উদ্দিন কায়কাউস, সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ, সুলতান জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, সম্রাট আকবর, সম্রাট শাহজাহান উল্লেখযোগ্য। যার ফলে অগণিত কবি ও সাহিত্যিক ফারসি ভাষায় কাব্য ও সাহিত্য রচনা করেছেন। যেমন- *কিতাব আল-হিন্দ*, *তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী*, *আইন-ই আকবরী* ও *কিরান উস-সা'দাইন* লক্ষণীয়। এসব সাহিত্যকর্মের গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। যা ভারতবর্ষের ফারসি ভাষার উন্নয়ন, অগ্রগতি ও বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। আলোচ্য প্রবন্ধে ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত গবেষণাধর্মী আলোচনা উপস্থাপনই মূল উদ্দেশ্য।

* সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

ভারতবর্ষ বহু প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর এক বিশাল জনসংখ্যার আবাসভূমি। জাতি, ধর্ম,আচার-আচরণের এক বিচিত্র মিলনক্ষেত্র। এখানে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, জৈন, পারসিক প্রভৃতি ধর্মবিশ্বাসের মানুষ বহুকাল ধরে নিজ নিজ ধর্মাচার পালন করা সত্ত্বেও পরস্পরের মিলনে গড়ে তুলেছে শান্তি ও সম্প্রীতির সহাবস্থান (সবুর খান ২০২১, ১৭)। ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার আগমনের ইতিহাস সুপ্রাচীন। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গ বিজয় করেন (সাফা ১৩৭৩, ১৩২)। মূলত তার বিজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ফারসি ভাষার আগমন ঘটে। এর পর থেকে ভারতবর্ষে ফারসি ভাষা বিদ্যমান রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মপ্রচারক, কবি, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ীসহ নানা শ্রেণির ফারসি ভাষাভাষী মানুষের আগমন ঘটে ভারতবর্ষে। এভাবেই ধীরে ধীরে ফারসি ভাষা ভারতবর্ষের মাটি ও মানুষের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। এছাড়াও ফারসি ভাষা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। দীর্ঘ সাড়ে ছয় শত বছর ব্যাপী রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত থাকার পর ১৮৩৫ সালে ইংরেজদের এক অধ্যাদেশে ফারসি ভাষা তার মর্যাদা হারায়।

ভাষার সংজ্ঞা

বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে তৈরিকৃত অর্থবোধক ধ্বনি-সংকেতের সাহায্যে মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকেই ভাষা বলে। আরো সহজভাবে বলতে গেলে, মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কণ্ঠনিঃসৃত বা মুখ থেকে বেরিয়ে আসা অর্থপূর্ণ কতগুলো আওয়াজ বা ধ্বনির সমষ্টিকে ভাষা বলা হয়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্’র মতে, “মনুষ্যজাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনিসকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তার নাম ভাষা” (২৩)। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, “মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে” (৩১)। ভাষাবিজ্ঞানীদের নিকট এ ভাষাগুলো বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে ফারসি ভাষা হলো মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের ইরানীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত একটি ভাষা। এ ভাষা তার উদ্ভবকাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বিকাশ লাভ করেছে।

ভাষার উৎপত্তি

মানুষ ভাষার উৎস নিয়ে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তেমন গবেষণা করেনি। কেবল অতি সম্প্রতি এ বিষয়ে নৃবিজ্ঞানী, জিনবিজ্ঞানী, প্রাইমেটবিজ্ঞানী এবং স্নায়ুজীববিজ্ঞানীদের আহরিত তথ্য কিছু কিছু ভাষাবিজ্ঞানী খতিয়ে দেখছেন। বিশ্বের অনেক ধর্মেই ভাষার উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের ধারায় বলা হয়, “আল্লাহ প্রথম মানুষ আদমকে বিশ্বের যাবতীয় পশু-পাখির উপর কর্তৃত্ব দেন এবং আদম এই সব পশু-পাখির একটি করে নাম

দেন” (সুরা বাকারা, আয়াত ৩১)। এটি ছিল ভাষা উৎপত্তির ক্ষেত্রে হযরত আদম (আ.)-এর ভাষাজ্ঞানের উপর প্রথম বড় প্রয়োগ।

ভাষা পরিবার

পৃথিবীতে প্রচলিত ও বিদ্যমান ভাষার আদি রূপ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রচলিত ভাষাগুলো কয়েকটি বিশেষ গোষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। একই স্তরের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যদি শব্দ ও ব্যাকরণগত মিল থাকে তবে সে ভাষাগুলোর মধ্যে বংশগত তথা উৎপত্তিগত মৌলিক সম্পর্ক থাকবেই যা ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে ভাষাবিজ্ঞানের একটি সূত্র বলে বিবেচিত (কাসেমী ১৩৭৮, ১৮)। একটি ভাষা পরিবার বলতে বংশগতভাবে সম্পর্কিত একাধিক ভাষাকে বোঝায়। এগুলো একটি সাধারণ আদি-ভাষা থেকে উদ্ভূত। বেশীর ভাগ ভাষাই কোনো না কোনো ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। এ সম্পর্কে Joel Waiz Lal বলেছেন,

> The Persian language belongs to the Aryan branch of the Indo-European family of tongues. A family of languages means a large group of exhibiting and unmistakable likeness in words, grammatical forms, and general structure of sentences. (1).

বিশ্বে প্রায় ১০০টিরও বেশি ভাষা পরিবার বিদ্যমান। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাষা পরিবার হলোঃ

১. ইন্দো-ইউরোপীয়

২. উরালীয় ভাষা

৩. সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠী

৪. আলতায়ীয় ভাষা

৫. চীনা-তিব্বতি ভাষা

৬. মালয়-পলিনেশীয় ভাষা

৭. আফ্রো-এশীয় ভাষা

৮. ককেশীয় ভাষা

৯. দ্রাবিড় ভাষা

১০. অস্ট্রো-এশীয় ভাষা

১১. নাইজার-কঙ্গো ভাষা

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার

পৃথিবীর সর্বাধিক মানুষ এই ভাষা পরিবারটির অন্তর্গত ভাষাগুলোতে কথা বলে এবং এই ভাষা পরিবারের উপরেই সবচেয়ে বেশি গবেষণা হয়েছে। এই ভাষা পরিবারের অন্তর্গত ভাষাগুলির মধ্যে রয়েছে ইংরেজি, পর্তুগিজ, ফরাসি, রুশ, গ্রিক, ফারসি, পশতু, হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মারাঠি, সিংহলি, নেপালি, গুজরাটি ইত্যাদি । এছাড়াও আছে ধ্রুপদী ভাষা যেমন, সংস্কৃত, লাতিন ও আদি পারসিক । ভারত থেকে শুরু করে ইউরোপ পর্যন্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা প্রচলিত ছিলো (সিরাজী ২০১৪, ১)। গবেষকদের মতে, ইন্দো- ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী মূলত নয়টি প্রাচীন শাখা নিয়ে গঠিত। যেমন : ১. ইন্দো-ইরানীয়, ২. ইটালিক, ৩. কেল্‌টিক, ৪. জার্মানিক, ৫. বাল্টো-স্লাবিক, ৬. গ্রিক, ৭. আল্‌বানীয়, ৮. আর্মেনীয়, ৯. তোখারীয় (সুকুমার সেন ২০০২, ৭১)।

ইন্দো-ইরানীয় ভাষা

ইরান নামক ভূখণ্ডটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শুরুতে ইরানিরা যে ভাষায় কথা বলতো তাকে প্রাচীন ইরানি ভাষা বা ইন্দো-ইরানীয় ভাষা বলা হতো। ইন্দো-ইরানীয় ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের একটি শাখা (সিরাজী ২০১৪, ৩)। আবেস্তা ভাষা ও পশ্‌তু ভাষা এই শাখার প্রাচীনতম দুইটি ভাষা। বর্তমানে প্রায় ১৫ থেকে ২০ কোটি লোক ফারসি দারি ভাষায় কথা বলে। এসআইএল-এর করা ২০০৫ সালের প্রাক্কলন অনুযায়ী ৮৭ রকমের ইরানীয় উপভাষা আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ভাষাটি হল ফারসিয়ে দারি। এছাড়াও পশ্‌তু ভাষাতে ৪ কোটি, কুর্দি ভাষাতে আড়াই কোটি, বেলুচি ভাষাতে ৭০ লক্ষ এবং আচোমে ভাষায় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ মানুষ কথা বলে।

ফারসি ভাষার পরিচয়

ইরানের জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য প্রায় তিন হাজার বছরের। বিশ্বের প্রাচীন সম্রাজ্যগুলোর মধ্যে পারস্য সম্রাজ্য অন্যতম। ইরানের সভ্যতা, শিল্প, ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখে এসেছে। বর্তমান ইরানের আদিবাসীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আর্য বংশোদ্ভূত (উদ্দিন ২০১৯, ৯)। ফারসি ভাষা হলো মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের সপ্তম শাখার অন্তর্ভুক্ত একটি ভাষা (আনিসুজ্জামান ১৯৮৭, ২৯৪)। পারস্যের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ভাষা থেকে ফারসি ভাষার উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানে ভাষাটির তিনটি সরকারি রূপ প্রচলিত রয়েছে। ইরানে এটি ফারসি ভাষা নামে পরিচিত। আফগানিস্তানে এটি দারি এবং তাজিকিস্তানে তাজিকি নামে পরিচিত (http//iranchamber.com)। ইরানীয় ভাষাগুলোর বিকাশ তিনটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। যেমন : প্রাচীন (খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম হতে খ্রিষ্টপূর্ব ৩য়), মধ্য (খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় হতে সপ্তম খ্রিষ্টাব্দ (৬৫০ খ্রি.) পর্যন্ত

এবং আধুনিক ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দ হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত (http//bangla.irib.ir)। আবেস্তা ভাষা এবং প্রাচীন ফারসি ভাষা প্রাচীন ইরানীয় ভাষার নিদর্শন। এই ভাষাতে জরথুস্ত্রবাদের পবিত্র গ্রন্থ *আবেস্তা* লেখা হয়। এ সম্পর্কে Tanwir Ahmed বলেছেন,

Among the old Iranian languages- the Avestan (most probably a language of eastern Iran) was the religious language of the Zoroastrians. It retained its status for several countries among the priests and followers of this religion. The Avesta, the sacred book of ancient Iran, contains the oldest documents of the prose and poetry of Iran. It is a collection of prayers and religious teachings of the Zarathushtra, the celebrated Prophet of Iran, who, as it is guessed, lived during the 7th century B.C (18).

জরথুস্ত্র ইরানের প্রাচীন যুগের মনীষী ও ধর্মসংস্কারক ছিলেন। তিনি এ ধর্মীয় গ্রন্থটি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রচনা করেছিলেন (সিরাজী ২০১৪, ৫)। ধর্মভিত্তিক প্রাচীন সাহিত্যিক মূল্যসম্পন্ন যে *আবেস্তা* গ্রন্থখানি পাওয়া গেছে তাতে জরতুস্ত্রের দেবতার 'মিত্র'র প্রশংসা ও প্রার্থনা বিষয়ক অনেক সুন্দর সুন্দর গাথা রয়েছে (মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ২০১০, ৭)। আবেস্তা ভাষা ধর্মীয় শাস্ত্রমূলক ব্যবহার ছাড়া পারস্যে ইসলামের আগমনের অনেক আগেই মৃত ভাষায় পরিণত হয়। প্রাচীন ফারসি ভাষাটি পারস্য সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমের কিউনিফর্ম লিপিতে ধারণ করা আছে। কিউনিফর্ম একটা লিপির নাম অর্থাৎ পেরেক আকৃতির বর্ণ। এগুলো মূলত সম্রাট প্রথম দারিউশ এবং প্রথম খাশইয়ররের আমলে লিপিবদ্ধ করা হয়। পাহলভি আশকানিযুগে (খ্রি.পূ.২৪৯-২২৬) পাহলভি বা মধ্য ফারসি নামে ইরানে আর একটি ভাষার উদ্ভব ঘটে। এটি মূলত আবেস্তা ও প্রাচীন ফারসির বিবর্তিত রূপ। এ ভাষার লিপিগুলো ডান দিক থেকে শুরু করে বাম দিকে লেখা হতো। এটি লেখার সময় সেমিটিক ভাষায় লেখা হতো আর উচ্চারণের সময় তা পাহলাভিয়াতেই উচ্চারিত হতো (পাল ১৩৬০, ১৬)। পাহলাভি হলো ইরানের প্রাচীন ফারসি ভাষার আরেক নাম। সাসানিদের রাজত্বকালে (খ্রি.পূ. ২২৬-৬৫২ খ্রি.) এ ভাষার উচ্চারণ ও আঙ্গিকগত উৎকর্ষ সাধিত হয়। এভাবে আশকানি ও সাসানিদের রাজত্বকাল মিলে প্রায় এক হাজার বছরব্যাপী এ ভাষা ইরানে প্রচলিত ছিল। এ শাসনামলে গ্রিক ও ভারতীয় মূল্যবান বইপত্র পাহলভি ভাষায় অনূদিত হয়। উল্লেখ্য যে, বিখ্যাত সাসানি সম্রাট নওশেরওয়ান ভারতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *পঞ্চতন্ত্র* পাহলভি ভাষায় অনুবাদ করেন (বাংলাপিডিয়া ২০০৩, ১৩৬)। প্রাচীন ফারসি খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ সালের দিকে হাখামানশি যুগে ইরানে এ ভাষার প্রচলন ছিল (Josef Wiesehofer 2007, 119)। এ ভাষা সাংকেতিক মিখ বা পেরেক আকৃতির চিহ্ন বিশেষের মাধ্যমে লেখা হতো। ভাষাটি কেবল রাজকীয় নির্দেশাবলি প্রচারের কাজেই ব্যবহৃত হতো। কারণ, স্বল্পসংখ্যক লোক এর পাঠ জানত। বিসতুন পর্বত ও নাকশে রোস্তমের পাথরে এবং পারসিপোলিস প্রাসাদের দেয়াল ও স্তম্ভে খোদাই করা শিলালিপিতে এ ভাষার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। আধুনিক ফারসি শেষ সাসানি সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদিগার্দ (৬৪৬-৬৫২ খ্রি.)-এর রাজত্বকালে মুসলমানগণ কর্তৃক ইরান দখলের পর ইরানের জনগণ বিপুলভাবে

ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। পাহলভি ভাষা ক্রমান্বয়ে ফারসিতে রূপান্তরিত হতে থাকে (বাহাউদ্দিন ও সালাম ২০১৫, ৫০)।

ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার আগমন

হিজরী চতুর্থ শতকে সামানিগণ সাহিত্যের দৃঢ় ও মজবুত একটি ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং ফারসি সাহিত্যের প্রতি সামানীদের মনোযোগের ফলেই পঞ্চম শতকে তথা গাজনভিদের যুগে ফারসি সাহিত্যের অগ্রগতি উন্নতি সাধিত হয়েছে। গাজনভি সম্রাটগণ ভারত থেকে যে সীমাহীন সম্পদ লাভ করেছিলেন তা তারা বিপুলভাবে কবি সাহিত্যিক ও লেখকদের মাঝে উপঢৌকন হিসেবে দান করেন। গাজনভিরা ভারতের পশ্চিম অঞ্চল দখলের মধ্য দিয়ে এবং সে অঞ্চলের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে এক নতুন রাজ্যে বা অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন যা ভারতীয় বা ভারত উপমহাদেশীয় অঞ্চল নামে প্রসিদ্ধ (আহাম্মদ তামীমদারী ২০০৭, ৪৮)। ইসলাম ধর্ম সর্বপ্রথম পারস্যে আগমন করেছে। ফারসিভাষীদের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রবেশ করে। তাই ইসলাম আগমনের সাথে সাথে ভারতবর্ষে ফারসি ভাষাও আগমন করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। মুসলিম শাসকগণ ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের সাথে সাথে ফারসি ভাষার প্রচার ও প্রসারে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। সুতরাং ফারসি ভাষার আধুনিক কাঠামো দান, পারস্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষা এবং ফারসিকে আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা প্রদানে মুসলিম শাসকদের অসামান্য অবদান রয়েছে। ফারসি ভাষার উন্নয়নে সুলতান মাহমুদ গাজনভির অসামান্য অবদান অনস্বীকার্য। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকাতে বলা হয়েছে, ফারসি সাহিত্যের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের নাম গাজনি এবং সুলতান মাহমুদ গাজনভি (মৃত্যু ১০৩০ খ্রি.)-এর দরবার (1962, 231)। একজন প্রতাপশালী যোদ্ধা হওয়ার পরও প্রেমের কবিতার প্রতি সুলতান মাহমুদের অনুরাগ ছিল। প্রকৃত অর্থে গাজনির শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসি গীতিকবিতা ও মহাকাব্যের বিকাশ ঘটে।

ফারসি ভাষার যেসব কবি ও সাহিত্যিক আধুনিক বিশ্বে আলোচিত ও সমাদৃত হয়েছেন তাঁদের প্রায় সবাই মুসলিম। যেমন- ফেরদৌসি, ওমর খৈয়াম, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, জালাল উদ্দিন রুমি, হাফিজ সিরাজী ও আমির খসরু অন্যতম। তাঁদের রচনাগুলো ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করেছে। ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকেই পারস্য সভ্যতা ও ফারসি ভাষার সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ রয়েছে। উভয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরস্পরের মাধ্যমে উন্নতি ও বিকাশ লাভ করে। ভারতের নৌ বন্দরগুলো যেমন- দেবল, নিরুন, সুপারাকা, বাড়িগাজা, টাগারা, মুজিরিস, নেলকিনডা, আরিয়েক, তাম্রলিপ্তি, গাঙ্গে, সাপ্তগ্রামা (সাতগাঁও/সপ্তগ্রাম), সরন্দিপ প্রভৃতি থেকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের নৌযান পারস্য উপসাগরের উবুলা, ওমানা, ইউডেইমন, সিরফ, কাইস, হরমুজ, সকোট্রা এবং গেড্রসিয়া উপকূল অতিক্রম করত। ফলে ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ও পারস্যের শুধু বাণিজ্যিক সম্পর্কই নয়, সাংস্কৃতিক সম্পর্কও গড়ে ওঠে। পারস্যের বণিক ও বাণিজ্যপণ্যের সঙ্গে পারস্য সৈন্যবাহিনী, প্রকৌশলী, কারিগর, সুফি-দরবেশ এবং শিল্পীদেরও ভারতে আগমন ঘটেছে। এ ধরনের সম্পর্ক পর্যায়ক্রমে রাজদরবার, সমাজ, শিল্প ও

সাহিত্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে (বাংলাপিডিয়া ২০০৩, ১৩৬)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ইংরেজি শিক্ষা আইন ১৮৩৫ প্রবর্তনের আগ পর্যন্ত মুসলিম শাসনের সব পর্যায়ে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফারসি। উদাহরণস্বরূপ, শাহ সুলতানের মাজারে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে নিষ্কর সম্পত্তি রয়েছে তার স্বীকৃতি ১০৮২ হিজরীতে (১৬৭১ খ্রিষ্টাব্দ) বাদশাহ শাহজাহানের পুত্র বাংলার সুবাদার শাহ সুজা ফারসি ভাষায় একটি সনদ রচনা করেছিলেন (মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন ২০০৯, ৪৭)। দীর্ঘ ৬৩৪ বছর রাজভাষা হিসেবে ফারসি ভাষা ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

আফগানিস্তানের পারওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের পারসিয়ান দারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মারিয়াম সাহেবি লেখেন, ভারতে মোগল শাসনামলে ভারতীয় সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, যা উভয় জাতির মধ্যে বিনিময় হয়েছিল তা ফারসি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এ সময় প্রায় সব ভারতীয় ভাষা ফারসি দ্বারা প্রভাবিত হয় (বাংলাপিডিয়া ২০০৩, ১৩২)।

ভারতবর্ষে মুসলমানের আগমন ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। মুসলমানের আগমনের ফলে আরবি-ফারসির অফুরন্ত শব্দভাণ্ডারে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে।

শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসির প্রভাব সম্পর্কে বলেন,

> মুসলমান আগমনের আগে বঙ্গভাষা কোনো কৃষক রমণীর ন্যায় দীনহীন বেশে পল্লী কুটিরে বাস করিতেছিলো। ...হীরা কয়লার খনির মধ্যে থাকিয়া যেমন জহুরির আগমনের প্রতীক্ষা করে, শুক্তির ভিতর মুক্তা লুকাইয়া থাকিয়া যেরূপ ডুবুরীর অপেক্ষা করিয়া থাকে, বঙ্গভাষা তেমনই কোনো শুভদিন, শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুসলমান বিজয় বাঙ্গলা ভাষার সেই শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করিল। গৌড়দেশ মুসলমানগণের অধিকৃত হইয়া গেলো। তাঁহারা ইরান যে দেশ হইতেই আসুন না কেন, বঙ্গদেশ বিজয় করিয়া বাঙ্গালী সাজিলেন (১৯৩৮, ১৮-১৯)।

ভারতে আগমনের পরবর্তীকালে পার্সি সম্প্রদায়ের জীবন ও অভিজ্ঞতা কেমন ছিল তা জানার একমাত্র সূত্র *কিসসা এ সানজান* নামক *তুরান* গ্রন্থটি। *কিসসা এ সানজান* গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী, জাদি রানা নামক একজন ভারতীয় শাসক ভারতে আগত জরথুস্ত্র গোষ্ঠিটিকে নিজ রাজ্যে বসবাসের অনুমতি দেন। বিনিময়ে তাঁদেরকে ঐ রাজ্যের প্রচলিত ভাষা এবং (নারীদের ক্ষেত্রে) পোশাক পরিচ্ছদ (শাড়ী) গ্রহণ করতে বলা হয়। প্রদত্ত শর্ত দুটি মেনে নিয়ে গোষ্ঠিটি ভারতে বসবাস শুরু করে । তাঁদের এই বসতিই পরবর্তীকালে সানজান নামক জনপদে পরিণত হয়। এদের পরেও ইরানের সারি অঞ্চল থেকে জরথুস্ত্রদের আরও একটি গোষ্ঠি ভারতে এসেছে বলে জানা যায়। সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সানজান অধিবাসীদের পূর্বেও বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে জরথুস্ত্রপন্থী বা বাদীদের আগমন

ঘটেছিল। পারস্যের সর্ব পূর্ব সীমান্তে বেলুচিস্তান প্রদেশ। আর বেলুচিস্তান প্রদেশ ঘেঁষে অবস্থিত সিন্ধু উপ্যতাকা। এই সিন্ধু প্রদেশও কিছুকাল পারস্য শাসনাধীন ছিল। সেই সময়টাই পারস্য সাসানি সাম্রাজ্যের (খ্রি.পূ. ২২৬-৬৫২ খ্রি.) অধীনে ছিল। ফলত সাসানি সাম্রাজ্যের বহু সামরিক প্রতিনিধি ও শিবির ছিল সিন্ধু প্রদেশে। সিন্ধু প্রদেশ হাতছাড়া হবার পরও পারস্য প্রতিপত্তি ও প্রভাব ফুরিয়ে যায়নি, বরং ইরান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পারস্যে ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সুপ্রাচীন জরথুষ্ট্র ধর্ম হুমকির মুখে পড়ে। নিজ ধর্মের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে জরথুস্ত্র ধর্মানুসারীগণ মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পার্সি উপগাথাগুলোতে তাঁদের পূর্বপুরুদের দেশান্তরের কাহিনী এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ইরানে আরবদের আগমনের পরপরই ভারতের পশ্চিম তীরবর্তী তটে পার্সিরা বসতি গড়ে তোলে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চ্যাপলিন হেনরি লর্ড মত প্রকাশ করেন যে, পার্সিরা চেতনার বিকাশ ও উন্মুক্তির খোঁজে ভারতগামী হয়েছিল। কিন্তু একই সাথে তিনি বলেন,

“জাত ব্যাবসায়ী পার্সিরা ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার সূত্রে ভারত অভিমুখী হয়েছিলেন। মুসলিম সাম্রাজ্যে অমুসলিম ব্যাবসায়ীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করা হতো। অনেকের মতে এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ নিষ্পেষণের পর্যায়ে পড়ে। তবে শুধুমাত্র এই কারণেই একটি জাতি দেশান্তরী হয়েছিলেন তার সম্ভাবনা ক্ষীণ (Encyclopeadia Britannica. Vol. 5, 852)।

ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার বিকাশ

মুসলিমদের ভারত বিজয় ও শাসনের ফলে ভারতে পারস্য সভ্যতার প্রভাব স্থানীয় জনজীবনে দৃশ্যমান। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পারস্য প্রভাব খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে শুরু হয়েছিল। ফলে ভারতীয়রা পারস্য সভ্যতার নানা উপকরণকে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশ হিসেবে গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে। এ কারণে ভাষা, সংগীত, স্থাপত্য, শিল্পকলা, সাহিত্যসহ নানা বিষয়ে ভারতীয়রা পারস্য সভ্যতার কাছে ঋণী। ভারতীয় সভ্যতায় পারস্যের প্রভাব নানা কারণে ঘটেছে। পারসিকরা ভারতের কতিপয় অঞ্চল শাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাচীন যুগে পারসিক সামরিক বাহিনীতে ভারতীয়দের নিযুক্তি, মধ্যযুগে ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে পারসিকদের নিযুক্তি, সুলতানি ও মোগল আমলে ভারতে পারসিক আলেম, উলামা, সাহিত্যিক-শিল্পীদের অংশগ্রহণ এবং ভারতের সঙ্গে পারস্যের কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করে।

বিজেতা শাসকদের প্রভাব

ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস তাঁর *The Histories* গ্রন্থে লিখেছেন, দারিয়ুসের সেনাবাহিনীর প্রতিটি স্তরে ভারতীয় সৈন্য নিযুক্ত ছিল। দারিয়ুসের পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী ভারতীয় সৈন্য দিয়ে সজ্জিত ছিল। ৩৩০

খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৃতীয় দারিয়ুসের সঙ্গে জগৎখ্যাত গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের যুদ্ধে ভারতীয় হাতি বাহিনী দারিয়ুসের হয়ে গ্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ভারতীয় অঞ্চলে পারস্যের শাসনের ফলে ভারত পারস্য সভ্যতার নিবিড় সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ লাভ করে। ফলে গোটা ভারতবর্ষে পারস্য সভ্যতার নানান বিষয় দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলে। মৌর্য রাজকীয় শিল্পে পারস্য প্রভাব তার বড় প্রমাণ। ভারতীয়রা ঐ যুগে পারস্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করত। সম্রাট অশোকের সময়ে ভারতীয় সভ্যতায় পারস্যের প্রভাব আরো সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয়। তার অনেক স্থাপত্যের নির্মাণ কৌশলে পারস্যের প্রভাব দেখা যায়। সাসানীয় যুগেও ভারতের গুপ্ত শাসকের সঙ্গে সাসানীয় শাসকদের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ঐ যোগাযোগের প্রভাব জনজীবনে পড়ে। এর প্রমাণ প্রাচীন ভারতে প্রাপ্ত অজন্তা গুহাচিত্রে পাওয়া যায়। অজন্তা গুহাচিত্রে সাসানীয় পোশাক পরিহিত পারস্য রাজার চিত্র অঙ্কিত আছে। কুশান, গান্ধারা ও গুপ্ত চিত্রেও সাসানীয় তথা পারসিক প্রভাব সুস্পষ্ট।

পারসিকদের ভারত অভিবাসন

ভারতে পারসিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবের প্রধান কারণ ছিল নানা সময়ে পারসিকদের ভারত অভিবাসন। প্রাচীনকাল থেকেই পারস্যবাসীর জন্য ভারত ছিল আশ্রয়স্থল। পারস্য যতবারই রাজনৈতিক সংকটে পড়েছে, বৈদেশিক শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে, ততবারই পারসিকরা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আলেকজান্ডারের পারস্য আক্রমণ ও বিজয়ের সময়ে অনেক পারসিকই প্রাণ রক্ষার্থে পালিয়ে ভারতে চলে আসে। ঐ সব অভিবাসী পরবর্তী সময়ে আর পারস্যে ফিরে না গিয়ে ভারতে স্থায়ী হয়েছে। তাদের ভারতে স্থায়ী বসবাসের ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পারসিক অনেক রীতিনীতির আত্তীকরণ ঘটেছে। সাধারণ মানুষ পারসিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছে এবং যেসব পারসিক সংস্কৃতি, চিকিৎসা পদ্ধতি ও রীতিনীতি উন্নত তা গ্রহণ করেছে। এভাবে ধীরে ধীরে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পারসিক প্রভাব দৃঢ় হয়।

শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা

মধ্যযুগে ভারতে মুসলিম বিজয় ও শাসনের ফলে আরব, তুর্কিসহ পারস্যের বিপুলসংখ্যক ভাগ্যান্বেষী মুসলিমের ভারতে আগমন ঘটে। তারা মুসলিম সুলতান ও বাদশা, আঞ্চলিক শাসক এবং সুফিদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে স্থায়ী হয়। ফলে তাদের মাধ্যমেও পারসিক সংস্কৃতি ভারতের অভিজাত থেকে নিম্নস্তরের মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করে। ভারতে মুসলিম বিজয়ের প্রথম দিকে পারসিক সংস্কৃতি ও রাজকীয় রীতিনীতি সুলতানদের দরবারি চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির বিনির্মাণে প্রভাব রাখে। এ ক্ষেত্রে সুলতান ইলতুৎমিশকে পথিকৃৎ বিবেচনা করা যায়। তিনি পারস্যের শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীদের ভারতে আমন্ত্রণ জানান। স্থায়ী বসবাসে উৎসাহিত করেন এবং তাদের জ্ঞানচর্চায় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। খিলজি যুগে দিল্লির সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় আমির খসরুর মতো অনেক পণ্ডিত ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করেন। লোদী যুগে

বিশেষ করে সিকান্দার লোদীর সময়ে পারসিক কবিরা রাজদরবারে বিশেষ মর্যাদা পান (রেজা রেজায়ী ১৩৯৪, ৩২)।

মোগল দরবার ছিল তুর্কি ও পারসিক শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের চর্চার জন্য উপযুক্ত স্থান। তারা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞানচর্চা করতেন। মোগল সম্রাট হুমায়ুনের পারস্যবাস এবং পারস্য শাসকের সহায়তায় হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারের ঘটনায় বিপুলসংখ্যক পারসিক সৈন্য ভারতে আগমন করে। তারা আর পারস্যে ফিরে না গিয়ে স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস শুরু করে। সুলতানি শাসনের দরবারি সংস্কৃতিতে পারস্যের প্রভাবের যে সূচনা হয় তা মোগল আমলে মহীরুহ আকার ধারণ করে।

সুফি সংস্কৃতি

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পারস্য প্রভাবের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় সুফি সংস্কৃতিকে। মূলত ভারতীয় মরমি ধারণা পারস্যে গিয়ে পারস্য ও ভারতীয় চিন্তার মিশ্রণে নতুন চিন্তার জন্ম দিয়েছে সুফিবাদ। যা রূপান্তরিত হয়ে মুসলিম যুগে ভারতে ফিরে আসে। ভারতের অর্ধেকেরও বেশি সুফি-সাধক পারস্য থেকে ভারতে অভিবাসী হয়ে ধর্ম প্রচার করেছেন। চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, সোহরাওয়াদিয়া তরিকার সুফিবাদের মূল জন্মস্থান পারস্য হলেও তা বিকশিত হয়েছে ভারতে। ঐ ঘরানার সুফিরা পারস্য থেকে এসে ভারতে স্থায়ী হয়ে তাদের সুফি মতবাদ প্রচার করেছে। সুফি সংস্কৃতির পুরোটা জুড়েই রয়েছে পারসিক প্রভাব যে কারণে ফারসি ভাষা দ্রুত বিকাশ লাভ করে (রেজা রেজায়ী ১৩৯৪, ৩৪)।

ঐতিহাসিক গ্রন্থরচনা

মধ্যযুগে ফারসি ভাষায় বহু ইতিহাসমূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, এর মধ্যে বেশির ভাগই রচিত হয়েছে ভারতে। আল বেরুনির *কিতাব আল হিন্দ*, জিয়া-উদ-দীন বরানীর *তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী* ও আবুল ফজলের *আইন-ই আকবরী* এর মতো ফারসি ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলো মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। এভাবে ধীরে ধীরে ফারসি ভাষার শব্দ ভারতীয় ভাষার শব্দভাণ্ডারে যুক্ত হয় (রেজা রেজায়ী ১৩৯৪, ৩৪)। কবর, মসজিদ, মাদরাসা ও বিভিন্ন স্থাপত্যে ফারসি শিলালিপিই ভারতবর্ষের সাথে ফারসির সম্পর্কের গভীরতা নির্ধারণ করে থাকে।

উপসংহার

মধ্যযুগে পারস্য প্রভাবিত মুসলিম শাসকরা ভারত শাসন করায় ভারতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে যার প্রভাব আজও বাংলাসহ ভারতের অন্য অঞ্চলের মানুষের জনজীবনে বিদ্যমান। পৃথিবীর অপরাপর ভাষার মতো ফারসি ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষা। এ ভাষা তার উৎপত্তির সময়কাল থেকে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান পর্যন্ত এসেছে। মানব ইতিহাসে দুই হাজার বছরের বেশি প্রাচীন সাহিত্য-দর্শনের

ঐতিহ্য ও ইতিহাস সমৃদ্ধ জাতির সংখ্যা খুব কমই আছে। নিঃসন্দেহে বিশ্বের সাহিত্যপ্রেমীরা ইরানি সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের কথা শুনে থাকবেন। ফেরদৌসি, ওমর খৈয়াম, শেখ সাদি ও হাফিজ সিরাজী মতো বিখ্যাত কবিদের কথা কিংবা ইবনে সিনা, আল-বিরুনি, আল-রাজি ও জহির ফারওয়াবির মতো মনীষীদের এবং তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কথা সবারই জানা। এঁদের সবাই ফারসি ভাষায় তাঁদের সাহিত্যকর্ম লিখে গেছেন। বিশ্বের বুকে তাঁদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার কারণে সাহিত্যপ্রেমীরা ফারসি ভাষার ব্যপারেও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ফারসি ভাষা মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় প্রধান ভাষা। ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইতিহাস, কালাম বা নীতিবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, ধর্ম-দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ফারসি ভাষায় যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলো আজও ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য মুসলমান ইসলাম এবং ইসলামি জ্ঞান ফারসি ভাষার মাধ্যমেই শিখেছেন।

তথ্যসূচি:

আল কুরআন, সুরা বাকারা, আয়াত-৩১।

আনিসুজ্জামান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭।

আহাম্মদ তামীমদারী, অনুবাদ- তারেক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও মোঃ ঈশা শাহেদী, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৭।

আবদুস সবুর খান, *ভারতবর্ষের অসামান্য কাব্য ও সংগীত প্রতিভা আমির খসরু*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২১।

তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, *ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, বাড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৪।

দীনেশচন্দ্র সেন, *প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলিমানের অবদান*, বেহালা, ঢাকা, ১৯৩৮।

বাংলাপিডিয়া, খণ্ড ৬, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩।

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (ড.), *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

মুহসেন আবুল কাসেমী, *তারিখে যাবানে ফারসি*, কেতাব খানেয়ে যহুরি, ইরান, ১৩৭৮।

মো : কামাল উদ্দিন, *ফরিদ উদ্দিন আত্তার : কাব্য ও সুফি দর্শন*, পরিলেখ প্রকাশনী, রাজশাহী, ২০১৯।

মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, *বাংলাদেশে মরমী সাহিত্য চর্চায় সৈয়দ আহমদুল হক*, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৯।

মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, ও মো: আব্দুস সালাম, *বাঙালি ও ইরানি : বঙ্গবন্ধু ও খোমেনি*, আবিষ্কার কোয়ালিটি পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৫।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, *পারস্য প্রতিভা*, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০১০।

যবিহ উল্লাহ সাফা, *তারিখে আদাবিয়্যাত দার ইরান*, ১ম খণ্ড, কিতাব ফুরুশিয়ে ইবনে সিনা, তেহরান, ১৩৭৩।

রেজা রেজায়ী, *যাবানে ফারসি দার হিন্দ বর আসাসে মুলাহিজাতে ইবনে বতুতা*, পুরতাল জমায়ে উলুম ইনসাানি, ইরান, ১৩৯৪।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৪২।

সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২।

হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশক অজিত চন্দ্রঘোষ, কলকাতা, ১৩৬০।

Encyclopeadia Britannica, Vol-5, 11, 12, 18, Cambridge University Press, London.

http//iranchamber.com

http//bangla.irib.ir

Joel Waiz Lal, *An introductory history of Persian literature*, Atma ram and sons educational publishers, Lahore, 1914.

Tanwir Ahmed, *A short history of Persian literature*, Naaz Publishing Centre. Calcutta, 1991.

Qissa-i SanjanWikipedia

Wiesehofer Josef, *Ancient Persia*, I.B. Tauris Ltd, 2007.